বিধবাবিবাহ কি নারীর যৌনতার স্বীকৃতি? বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন আজকের প্রেক্ষিতে

শেখর শীল

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।[১]

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শান্তিপুরের তাঁতীরা 'বিদ্যাসাগর পেড়ে' নামে একরকম শাড়ি তৈরি করে সেখানে এই গানটি লিখে দিতেন। এর থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ঢেউ শুধু কলকাতার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, শান্তিপুরের মতো জনপদেও তা অনুভূত হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে আধুনিকতার অন্বেষণে যখন বাঙালি তার যাত্রা শুরু করে, সেখানে সেই পথের একটি অন্যতম বৈপ্লবিক স্বাক্ষর অবশ্যই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন। তবু মাঝে মাঝেই প্রশ্ন ওঠে, এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিমুখ, তার তাৎপর্য, তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে। অবশ্য বিধবাবিবাহের মতো একটি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হবে, অথচ সেটা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ হবে না, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে না, তার অর্জন, উপলব্ধিকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না, সেটা কখনোই হতে পারে না। এমনকি সেটা হওয়া কাম্যও নয়। সে ক্ষেত্রে বিষয়টি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। হয়ত নিছক সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরিখে তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। এই দিক থেকে বিচার করলে বিধবাবিবাহ-এর পক্ষে যারা সমর্থনসূচক বক্তব্য পেশ করেছিলেন, অথবা যারা এর বিরুদ্ধে যুক্তি শাণিত করেছিলেন তাদের সকলেরই ধন্যবাদ প্রাপ্য, কেননা এই সকল বাদানুবাদ শুধু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই নয়, বিংশ শতাব্দী পার করে আজকের একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসেও এর গুরুত্বকে, আন্দোলনের তাৎপর্যকে, তার বহুমাত্রিকতাকে একদিকে যেমন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে দেয় না, তেমনি প্রণোদিত করে এই আন্দোলনকে নতুন করে আবার বুঝে ওঠবার। আজকের প্রেক্ষিতে প্রায় দেড়শ বছর আগে গড়ে তোলা এই আন্দোলনকে যখন আমরা বিচার করতে বসব, তখন কে বলতে পারে যে নতুন কোনো অনালোচিত দিক উঠে আসবে না! আজ যখন সদ্য আমরা বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী পার করে এলাম, সেখানে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন'কে কেন্দ্র করে যে তর্ক-বিতর্ক সে সময়ে বাঙালির আকাশ-বাতাসকে উদ্বেল করেছিল, সেইসব কিছু একভাবে আমাদের কাছে পরম পাথেয়, যার উপর দাঁড়িয়ে বিধবাবিবাহ নামক আন্দোলনের তাৎপর্যকে হয়ত অন্য আঙ্গিকে দেখবার চেষ্টা করতে পারি।

[১] বিনয় ঘোষ (১৯৮৪), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, পৃ. ১৫২

অস্বীকার করে লাভ নেই যে, বিধবাবিবাহ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং সেই ব্যর্থতাকে বোধহয় বিদ্যাসাগর স্বয়ং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এক চরম আশাহত বেদনাকে বুকে নিয়ে। তা না হলে তাঁর মতো দৃঢ়চেতা ব্যক্তির কাছ থেকে এমন খেদোক্তি কেন শুনতে হবে যে, "আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনোই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"[২] আসলে কোমল স্বভাব বাঙালি মন বিধবাবিবাহের বৈপ্লবিকতাকে আত্মস্থ করতে না পেরে বিরুদ্ধ সমালোচনার তোড়ে ভেসে গিয়েছিল, যার ফলে বিশেষ মানবিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তিবিন্যাসের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও আমাদের সাধারণ আটপৌরে চিন্তাভাবনার জগতে এই আন্দোলন এক প্রকার ব্রাত্যই থেকে যায়। যেহেতু এই আন্দোলন সাধারণ বাঙালির বুকে জগদ্দল পাথররূপে চেপে বসে থাকা ভাবজগৎকে টলাতে ব্যর্থ হয়েছিল, সংখ্যাগতভাবে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে খুব বেশি বিধবার ভাগ্য যে পরিবর্তিত হবে, সেটা কীভাবে সম্ভব? সংখ্যাতত্ত্বের জায়গাটা যদি বাদও দিই, সে ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন চলাকালীন এবং তার পরবর্তী সময়ে এমন কিছু গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, যার মধ্য দিয়ে সামাজিকভাবে নারীমুক্তির প্রশ্নে এই আন্দোলনের যথার্থতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নতুন করে মূল্যায়নের ক্ষেত্র তৈরি হয়। অবশ্য এই আন্দোলনের যথার্থতা ও তার শাস্ত্রীয় সমর্থনকে কেন্দ্র করে সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হওয়ার পরপরই। যে পরাশর সংহিতার বচনকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করেছিলেন, ১৮৭৪ সাল নাগাদ বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ তাঁর 'বিধবা ধর্মরক্ষা' নামক রচনায়, তাঁর বিরুদ্ধে শাস্ত্রকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার অভিযোগ আনেন। অর্থাৎ পরাশর সংহিতার বচনকে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে বিকৃতভাবে তুলে ধরেছেন, এটাই তিনি বলতে চান।[৩] ফলে বিধবাবিবাহ আইনস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তার শাস্ত্রীয়তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হয়। এই শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের সূত্র ধরেই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করে বলার চেষ্টা হয় যে, বিধবাবিবাহের মতো একটি সামাজিক সমস্যাকে শাস্ত্রীয় যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আসলে বিদ্যাসাগর এমন এক শাস্ত্রীয় গোলকধাঁধার আবর্তে পড়েন, যার ফলে পুরো বিষয়টি তাঁর মানবিক প্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলে। এখন শাস্ত্রকে ভিত্তি করে তিনি সেই সময়ের নিরিখে সঠিক কাজ করেছিলেন কি না, এই প্রশ্ন এক অন্যতর আলোচনার দাবি রাখে। তবে তাঁর জীবদ্দশাতেই বিধবাবিবাহের একটা নেতিবাচক সামাজিক ফলাফল তাঁর সামনে উন্মোচিত করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। 'বিষবৃক্ষ' নামক উপন্যাসের অবয়বে তিনি এই বিষয়ে যে প্রাসঙ্গিক বার্তাটি তুলে ধরেন তা হলো, যেহেতু বাঙালি সমাজে বহুবিবাহ প্রথা আগের মতোই বহাল ছিল এবং বিদ্যাসাগর হাজার চেষ্টা করেও যখন সেই বিষয়ে কোনো নিবৃত্তিমূলক আইন আনতে পারেন নি, অন্যদিকে বিধবাবিবাহের মতো সদর্থক আইনের ব্যবস্থা হয়েছিল, ফলে সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে বৃহত্তর জনমানসে এই আশঙ্কা তৈরি হয় যে,

[২] তদ্‌শ, পৃ. ২৭৬

[৩] স্বপন বসু (১৯৯৩), সমকাল বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, পৃ. ৫১

কুমারী মেয়েদের সাথে সাথে এখন থেকে বিধবাও বিয়ের পাত্রী হিসেবে পুরুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। এই পরিস্থিতি বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে কতখানি মর্যাদাপূর্ণ হবে, সেই প্রশ্নের থেকেও বড়ো হলো, এর ফলে বাড়ির যে বউটি আগে থেকে বিবাহিত, তার উপর কি সাংঘাতিক আঘাত নেমে আসবে।[৪] এই প্রসঙ্গেই অনেকের বক্তব্য হলো, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের মতো আন্দোলনে শ্রম, অর্থ ব্যয় না করে যদি বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতেন, সে ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে তার ফলাফল হয়ত অন্যরকম হলেও হতে পারত। সব থেকে বড়ো কথা এই যে তিনি তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার সূচনা করেছিলেন বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে এবং 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে যে পুস্তকটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি এক অর্থে ছিল বৈপ্লবিক। কারণ, তিনি এই প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে কোনোরকম শাস্ত্রীয় বচনের দোহাই দেন নি, মানবিক যুক্তিবোধের উপর দাঁড়িয়েই তিনি এই প্রথাকে নাকচ করেছিলেন।[৫] আশ্চর্যের এই যে, তিনি পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আর দ্বিতীয় কোনো উদ্যোগ নেন নি, কোনো আন্দোলনও সংগঠিত করেন নি।

এখানে কেউ এমন প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, নারীমুক্তির প্রশ্নকে সামনে রেখে বিদ্যাসাগর এবং আরো অনেক সংস্কারক যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সেখানে প্রচলিত বৈবাহিক বিধি ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রশ্নে এতখানি গুরুত্ব প্রদান করা হলো কেন? নারীমুক্তির প্রশ্নে আরো অন্যান্য বিবিধ উপায়-পদ্ধতির কথা তো ভাবা যেতেই পারত এবং সেইরকম ভাবনা অমূলক তো ছিলই না বরং শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও উন্নতির যে পথ, সে পথে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নিজে নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। সাফল্যের বিচারে শেষ অবধি নারীশিক্ষার বিষয়টি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে দাঁড়িয়ে যায়, যার প্রমাণ সমস্ত প্রতিকূলতা ও বিরূপতা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে ও উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি। সে ক্ষেত্রে, নারীমুক্তির প্রশ্নে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার সংস্কার, যার মধ্যে ছিল বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং অবশ্যই বিধবাবিবাহ, কেন বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টায় এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর বিশেষ শ্রেণিচরিত্র ও শ্রেণি-মানসিকতার বিষয়টি অনেকে আমাদের মনে করাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বামপন্থী মূল্যবোধের নিরিখে বিদ্যাসাগরকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই বক্তব্য উঠে আসে যে, তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলনসহ যাবতীয় সংস্কার প্রচেষ্টা কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি, এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও তেমনটা চান নি তাঁর বিশেষ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি-মানসিকতার দরুন। এই বিচারে তাঁকে দাঁড় করানো হয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মুখপাত্র রূপে, যাঁর ফলস্বরূপ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহসহ এই জাতীয় সংস্কার প্রচেষ্টা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করতে পারে নি। বিবাহবন্ধনকে

[৪] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (২০০৯), 'মতৈক্যে মতানৈক্যে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ২০১

[৫] স্বপন বসু (১৯৯৩), সমকালে বিদ্যাসাগর, পৃ. ০৩

ছিন্ন করে বৃহত্তর জগতে বাঙালি নারীকে মুক্তি দেওয়ার কাজটি তাই অধরাই থেকে গেছে।[৬] বামপন্থী এই অভিযোগকে অনেকটা সমর্থন করেছেন কিছু নারীবাদীও, যাঁরা বলতে চেয়েছেন যে বিধবাবিবাহের মতো সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যেমন একভাবে বিদ্যাসাগর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চাহিদামতো নারীকে তাদের শ্রেণিমর্যাদার প্রতীকরূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন, অন্যদিকে প্রচলিত ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে গিয়ে তিনি নারীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেই পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে, পুনর্বার তাদের বিবাহের নিদান দিয়ে। অথচ এই পারিবারিক বিধি-ব্যবস্থাই বাঙালি নারীর মুক্তির পথে প্রধানতম বাধা, যা শতকের পর শতক ধরে একইভাবে বিদ্যমান।[৭] মানে দাঁড়াল এই যে, বামপন্থীদের অনেকের মতো, অনেক নারীবাদীর কাছেও বিদ্যাসাগর এবং তাঁর পরিচালিত বিধবাবিবাহের মতো সংস্কার প্রচেষ্টা আসলে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণির যে অ্যাজেন্ডা তার অংশ। কিন্তু এই সকল সীমাবদ্ধতা, সমালোচনাকে পাশে রেখে যদি একজন নারীর দৃষ্টিতে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের দিকে তাকানো হয় এবং এই প্রশ্নটি যদি সে ক্ষেত্রেও উঠে যে এই আন্দোলন তিনি এইভাবে সংঘটিত করলেন কেন, তাহলে অনেকেই হয়ত এমন কিছু উত্তর হাতড়াবেন, যা পরিশেষে বিদ্যাসাগরের জীবনের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করবে; যেমন রাইমনির প্রসঙ্গ। পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসার পরে তাঁরা যেখানে থাকতে শুরু করেন সেই সিংহ পরিবারের বিধবা কন্যা রাইমনি, যে এক সন্তানসহ অত্যন্ত অল্প বয়সে বিধবা হয়। সে বালক বিদ্যাসাগরকে সর্বত্র নিজ সন্তানের মতো করে স্নেহ-মমতায় আগলে রাখত। কিন্তু তাঁর প্রতি রাইমনির মাতৃস্নেহের সাথে সাথে তার বৈধব্যযন্ত্রণাকেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। বলা হয় যে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা রাইমনির এই বৈধব্যযন্ত্রণা পরবর্তী সময়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে বিদ্যাসাগরকে বাধ্য করে। এর পাশাপাশি আরো একটি প্রচলিত ধারণা হলো যে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে এরকম একটি আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। মা ভগবতী দেবী নাকি একবার বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'তোদের শাস্ত্রে কি এমন কোনো বিধান নেই কোথাও, যাতে এই দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটানো যায়?'[৮] অর্থাৎ মায়ের এই আকুতিকে তাঁর আদেশরূপে শিরোধার্য করে বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে ব্রতী হন।[৯] কিন্তু ছেলের প্রতি ভগবতী দেবীর আকুতি, কিংবা রাইমনির বৈধব্য অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কি এতটাই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, যাতে করে তিনি বিধবাবিবাহের মতো একটি 'বৈপ্লবিক' বিষয়কে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ভাবলেন? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা মায়ের অনুরোধ তাঁর জীবনে যতই প্রভাব ফেলুক

[৬] স্বপন বসু, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা) (২০০০), উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১০৪-০৫

[৭] হিমানী ব্যানার্জী (২০০১), ইনভেনটিং সাবজেক্টস : স্টাডিস্ ইন হেজেমনি, প্যাট্রিয়ার্কি অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম, তুলিকা বুক্স, নিউ দিল্লী, পৃ. ১১৮

[৮] বিনয় ঘোষ (১৯৮৪), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ৫৬-৫৭

[৯] বিদ্যাসাগর রচনাবলী (২০০৬) (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যম, কলকাতা, পৃ. ৪০৪

না কেন, তার উপর দাঁড়িয়ে তিনি এরকম একটি বৃহত্তম সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুললেন, এই সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় বেশ কষ্টকল্পিত।

ফলে যে ভাবনাটা উঠে আসে তা হলো যে, বিধবাবিবাহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদানের পেছনে সামগ্রিকভাবে তাঁর নারী সম্পর্কিত কিছু আপাত অদৃশ্য চিন্তা কাজ করেছিল। অর্থাৎ শুধু বিবাহের মধ্য দিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া নয়, নারী হিসেবে তার সত্তা, তার ধারণা, ব্যক্তি হিসেবে তাকে দেখার চেষ্টা করা, এসবই হয়ত ছিল এই আন্দোলনের অনুচ্চারিত দিক, অথচ সর্বাধিক বৈপ্লবিক উপাদান। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পৌঁছে পেছন ফিরে উনিশ শতকে সংগঠিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে দেখতে গিয়ে সেখানে একটি বিষয় এই মুহূর্তে বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, এই আন্দোলন কোনো না কোনো দিক থেকে সমাজে প্রচলিত নারীর যে সতীত্বের ধারণা তাকে পালটাতে চেয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, যখন আমরা বিধবাবিবাহ নিয়ে অনেক গালভরা কথা বলি অথবা কটূ সমালোচনায় বিদ্যাসাগরকে বিদ্ধ করি, তখন সতীত্বের ধারণাকে উলটে দেওয়ার মতো এরকম চাপা পড়ে থাকা বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। সেই কারণে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের এই দিকটি সম্পর্কে অত্যন্ত ভাসাভাসা ধারণা তৈরি হলেও তেমনভাবে গভীরে পৌঁছে আলোচনার পরিসর আজো তৈরি হয় নি। সেটা আজো অনুপস্থিত। তবে এই সতীত্বের প্রশ্নটির পাশাপাশি একজন নারীর অবস্থান থেকে দেখলে বিধবাবিবাহ কি অন্য কোনো বার্তা দিতে চেয়েছিল, যা হয়ত আজো আমরা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি নি। অথচ বিধবাবিবাহসহ অন্যান্য বিবাহ সংস্কারগুলিকে একটু অন্যভাবে যদি পড়া যায়, তাহলে এক ভিন্ন বোঝাপড়ার দিকে আমরা এগোতে পারি এবং সেই বোঝাপড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নারীর যৌনতার স্বীকৃতির প্রশ্ন। সত্যিই কি বিধবাবিবাহসহ সার্বিক সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সময়ে অন্তত প্রাথমিকভাবে হলেও বিদ্যাসাগরের মাথায় বাঙালি নারীর যৌনতার স্বীকৃতির মতো একুশ শতকীয় ভাবনা কাজ করেছিল? বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেও যে, নারীর নিজ যৌনতার প্রতি তার নিজের অধিকার এবং সেই অধিকারের স্বীকৃতি বৃহত্তর অর্থে নারীর যে সত্তা তার সঙ্গে জড়িত। আজ যেভাবে নারীর যৌনতার স্বীকৃতিকে তুলে ধরা হয়, যেভাবে এই বিষয়টিতে আইনি ও সামাজিক চাপ খাতায় কলমে হয়ত অনেকটাই অপসৃত, উনিশ শতকে সেরকমটা যে ছিল না সেটা তো সকলেরই জানা। সেখানেই আরো একটি প্রশ্ন ওঠে, বিধবাবিবাহের মতো সংস্কার আন্দোলনের সূত্রে বিদ্যাসাগর যদি আদৌ এরকম কিছু ভেবে থাকেন, তাহলে সেই ভাবনার স্বরূপ কেমন ছিল?

২.

> দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা, যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত শত বিধবারা ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত

> করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণার নিবারণ, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের পরিহার ও তিনকুলের কলঙ্কমোচন হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইতেছে, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।
>
> পরিশেষে, সর্বসাধারণের নিকট বিদায়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়া দেখুন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।[১০]

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বাঙালি নারীর জন্য বিধবাবিবাহের প্রয়োজনের বিষয়ে উল্লিখিত বক্তব্যটি বিদ্যাসাগর তুলে ধরেছিলেন তার 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিয়ক প্রস্তাব'-এর প্রথম পুস্তকে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না'-এর দ্বিতীয় পুস্তকেও তিনি একইভাবে একই অবেগঘন লেখনীর মাধ্যমে বাঙালি মেয়েদের দুর্বিষহ অবস্থা হেতু বিধবাবিবাহের তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

> হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমোদ শয্যায় শয়ান করিয়া থকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য ও যথার্থ মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপে দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সংকল্প করিয়া, লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম, প্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে

[১০] তদৃশ, পৃ. ৫১১-৫১২

> দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভবিত তোমার প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপ ভয় জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ, বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ, ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।
>
> হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।[১১]

লক্ষণীয়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের দুটি পুস্তকেই মূলত যে বিষয়টি এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির মধ্য থেকে উঠে এসেছে তা হলো বৈধব্যজনিত ব্যভিচার এবং তজ্জনিত ভ্রূণহত্যা। যেহেতু লৌকিক আচার সংস্কার এতই প্রবল যে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় এ ক্ষেত্রে বের করা প্রায় অসম্ভব, ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজ, তাদের জাত, কুল-মান সবই এক নিরতিশয় পঙ্কিল আবর্তে পরিণত হচ্ছে। সামাজিক কুল-মান রক্ষা করার প্রয়াসে মেনে নিতে হচ্ছে অজস্র ভ্রূণহত্যা। কিন্তু এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্য যে স্বামীহারা হলেই বিধবা নারীর যাবতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেমন শেষ হয়ে যায় না, তেমনি আদিম রিপু ও আজকের দিনের ভাষায় বললে যৌন আকাঙ্ক্ষাও পূর্ববৎ বজায় থাকে। অথচ এই সহজ সরল সত্যটি এদেশের জ্ঞানী-গুণী শাস্ত্রবিশারদরা বুঝতে চান না, অথবা শাস্ত্রও দেশাচারের দোহাই দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি পড়লে অনেকের মনে হওয়াটাই অস্বাভাবিক নয় যে বৈধব্যজনিত ব্যভিচার এবং ভ্রূণহত্যাজনিত ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সামাজিক ও পারিবারিক সম্মানরক্ষার বিষয়টি নিয়েই তিনি বেশি ভাবিত। এটা ঠিক যে এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যেভাবে বিশিষ্ট পারিবারিক কুল-সম্মানের প্রশ্নটি সামনে এনেছেন, সেখানে এমনটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁর নেতৃত্বে তৈরি হওয়া বিধবাবিবাহ আন্দোলন যেন

[১১] বিদ্যাসাগর রচনাবলী (২০০৬) (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১২৯৭

এই তথাকথিত বংশগত, কুলগত 'সম্মান' পূর্ববৎ বজায় রাখার জন্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিল। আমরা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছি যে যারা বিদ্যাসাগরের যাবতীয় সংস্কার প্রচেষ্টাকে শ্রেণিগত প্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে চান, তাঁরা এই আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির শ্রেণিগত স্বার্থ ও ইমেজের সাপেক্ষে এই আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেন। এখন এই শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে কুলগত, বংশগত মান-সম্মানের প্রশ্নটিকে পাশে সরিয়ে একজন নারীর চোখ দিয়ে দেখলে এক ধরনের স্বীকৃতি ধরা দেয়। সমস্ত উদ্ধৃতির মধ্যে এই স্বীকৃতির বিষয়টি হয়ত বিসদৃশভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ। তবু এই দুটি আপাত আবেগসঞ্জাত বক্তব্যই নারীর যে যৌন আকাঙ্ক্ষা তাকে শুধু মেনে নেয় না, সমাধানের পথেও এগোতে চায়। এই দুটি বক্তব্যকে হাজির করতে গিয়ে যখন তিনি বলেন : 'দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করেন।' সেখানে বিধবাদের যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করতে যে ধরনের সামাজিক শাসন ও বিধিনিষেধ তাঁর উপর নেমে আসে তিনি শুধু তাকেই নির্দেশ করেন না, একজন নারী হিসেবে তাঁর যৌনতার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর পরিতৃপ্তির বিষয়টিও যে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেটাও আবেগজনিত ভাষায় অনুচ্চভাবে তুলে ধরেন। তা না হলে তিনি তাদের জন্য বিয়ের সুপরিশ করবেন কেন? তাঁর সমকালে সদ্য বিধবাদের উপর নেমে আসা বিভিন্ন বিধিনিষেধকে দূরীভূত করার কথা বললেই তো অনেকখানি সমাধানের পথে এগোনো যেত। 'বিধবাবিবাহ...' দ্বিতীয় পুস্তকে এই বিষয়টিই তিনি আরো একটু সোচ্চারভাবে বলার চেষ্টা করেন, যেখানে তাঁর সেই বিখ্যাত কথা শুনতে পাই : 'তোমরা মনে কর, পতি বিয়োগ হইলেই স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।' যেহেতু স্বামীহারা হলেই যে নারীর যৌন ইচ্ছা শেষ হয়ে যায় না, কোনোভাবেই যে তা সম্ভব নয় সেটাকেই যেন এই বক্তব্যে বেশ বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনি। আর সেখানেই সমাধান হিসেবে এসেছে তাঁদের পুনর্বার বিবাহের প্রসঙ্গটি।

প্রশ্ন হতে পারে যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নারীর যৌনতার স্বীকৃতিকে যেভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে বিদ্যাসাগর কি সেভাবেই দেখতে চেয়েছিলেন? একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, যখন আমরা প্রতি মুহূর্তে এক ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছি এবং যার হাত ধরে সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থানেও বদল এসেছে, সেখানে নারীর যৌনতা বিষয়ক চিন্তাভাবনা যে তাঁর সাবেকী ধ্যানধারণা থেকে সরে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। আবার এটাও স্বীকার করতে হবে যে সাধারণভাবে যৌনতার বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে নারীর যৌনতাকে নিয়ে সামাজিক তথা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধ আজ অনেকটাই শিথিল হয়েছে, অন্তত এমন একটা পরিসর তৈরি হয়েছে যেখানে নারীর যৌনতা বিষয়ে তাঁরা নিজেরা এমনকি অন্যরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের বক্তব্যকে তুলে ধরতে পারে। ফলে যেটা আমাদের দরকার তা হলো, এই নারীর যৌনতাকে আমরা কীভাবে, কী অর্থে বুঝতে চাইছি

সেটাকে তলিয়ে দেখা। এখানে আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে নারীর যৌনতার প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে সমাজ-পরিবার তার পরিবর্তিত অবস্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, বলতে গেলে এই অবস্থানের পরিবর্তনটি যদি না থাকত তাহলে তাঁর যৌনতা বিষয়ক যাবতীয় ভাবনাচিন্তার উৎসমুখ হয়ত উন্মোচিত হতে পারত না। আর এটি তো স্বতঃসিদ্ধ যে সমাজ-সংসারে, 'পুরুষ'শাসিত বাইরের জগতে নারীর এ নতুন পরিবর্তিত অবস্থান আন্দোলিত করবে তার একান্ত নিভৃত মনের জগৎকে, যে জগতের সঙ্গে নিত্য যাতায়াত তার যৌনতার আকাঙ্ক্ষার। সেই জন্যেই বিশিষ্ট মনোবিদ অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবেই দেখতে চেয়েছেন। নারীর যৌনতার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এইরকম :

> মেয়েরা আজ আর 'জয়যাত্রায় যাও গো' বলে ধান-দুব্বো কেটে পুরুষসঙ্গীটিকে রথে তুলে দিয়ে রান্নাঘরে চোখ মুছছে না। বরং নিজে আরেকটা রথ কিনে 'আমার রয়েছে কর্ম আর বিশ্বলোক' অবলীলায় বলতে পারছে। মেয়েদের হাতঘড়ি এখন রাত্তিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরের পথে ঝলসে উঠছে, মেয়েরা নিজেদের সম্মান আগলে নেওয়ার ভাষায় শান দিচ্ছে, নিজের যৌন আবেদন নিয়ে কুণ্ঠিত না হয়ে আদরের দাবি জানাচ্ছে...[১২]

অর্থাৎ বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই একজন মনোবিদ অন্তত আজকের বাঙালি নারীর যৌনতা সম্পর্কিত তার মানসিকতাকে বা তার যৌন চাহিদার দাবিকে ঘরে-বাইরে তার যে বলিষ্ঠ বিচরণ, তার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করছেন। মানে, সমাজ-সংসারে নারীর অবস্থান, নারীর যৌনতার স্বীকৃতির সঙ্গে যুক্ত, বোধহয় উলটোটা নয়। অন্তত অনুত্তমার বক্তব্য সেই দিকেই ইশারা করে। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিপরীত অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কারণ সেই সমাজে নারীর অবস্থান তো আজকের মতো ছিল না। কিন্তু তাঁর যৌনতার প্রশ্নটি ভয়াবহভাবে বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তে, পারিবারিক তথা জনপরিসরে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের আকারে উঠে এসেছিল, সৌজন্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এবং তজ্জনিত অল্প বয়সে বাঙালি নারীর বৈধব্য। বিধবা নারীর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিষয়টি, তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হাজারো বিধিনিষেধ আজ হয়ত কালের নিয়মে, অথবা সামাজিক সচেতনতার ফলে কিংবা নারীর নিজস্ব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ যেভাবে অনেকটা শিথিল হয়েছে, বিদ্যাসাগরের কালে বৈধব্যের নিয়ম পালন হেতু এই সকল কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেও তার যৌনতার প্রশ্নটিকে মীমাংসা করা সম্ভব হয় নি। একজন সুস্থ, সবল পুরুষের মতো একজন নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সেই বিষয়টি তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ তথা সমাজপতিরা বুঝতে চান নি বা বুঝতে পারেন নি। যদি কোনোকিছুর স্বাভাবিক নির্গমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সে অন্ধ গলিঘুঁজির মধ্যে তার পথ খোঁজে। তারই পরিণামে বৃদ্ধি পায় ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সমাজস্বীকৃত একটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটা পথ

[১২] অনুত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯), অনু-সঙ্গ, কারিগর, কলকাতা, পৃ. ৯৭-৯৮

খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্যই তিনি সোচ্চার হয়ে এই বিষয়টিকে তুলে ধরতে পারেন নি। সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি তাকে সেই সুযোগ দেয় নি। সেইজন্য তাঁকে শ্রেণিগত, বংশগত, কুলগত গৌরবের বিষয়টিকে সামনে রেখে এই প্রশ্নের সমাধানে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এইদিক থেকে দেখলে তাঁর এই প্রচেষ্টা আজকের অনেক দুঁধে রাজনীতিবিদের মতো এই শিক্ষা দিতে পারে যে কীভাবে এতজন তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে অর্জন করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলিকে হাতিয়ার করে এগোতে পারেন। অবশ্যই লক্ষ্যটি যেন বৃহত্তর ও ইতিবাচক হয়।

তবে নারীর যৌনতার প্রশ্নটি কিন্তু বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বক্তব্যের বাইরে বৃহত্তর সংস্কার আন্দোলনের পরিসরে অন্যত্রও বিদ্যাসাগর তুলে ধরতে চেয়েছেন। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রতিরোধকল্পে তিনি যে সকল যুক্তি হাজির করেছিলেন, সেখানে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়, যা সরাসরি না হলেও কিছুটা ঘুরিয়ে নারীর যৌনতার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন 'বাল্যবিবাহের দোষ' পুস্তকে তাঁর বক্তব্য ছিল :

> বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপে অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।[১৩]

সাধারণভাবে তিনি যেভাবে বাল্যবিবাহের দোষকে চিহ্নিত করেছেন, সেখানে ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই যে এই ব্যবস্থা বিশেষ অমঙ্গলজনক সেটাই আপাত অর্থে প্রতীয়মান হয়। তবে শেষপর্যন্ত এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একটি মেয়ের জীবনে বাল্যবিবাহ কী ধরনের সমস্যা ডেকে আনে সেটাই তার চিন্তার মূল জায়গা। কেননা প্রভাবের দিক থেকে এই ব্যবস্থা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে একইরকমভাবে বর্তায় না। মেয়েদের ওপর এই ব্যবস্থার অভিঘাত রীতিমতো ভয়ঙ্কর। নারী হয়ে ওঠার পূর্বেই তাদের ওপর এই ব্যবস্থার যে প্রভাব নেমে আসে তা কিন্তু পুরুষ হয়ে ওঠার পূর্বে ছেলেদের ওপর আরোপিত প্রভাবের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ভারী, দুর্বিষহ। সব থেকে বড়ো কথা হলো, যৌনতার যে বোধ দুটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং পুরুষকে অন্যান্য বিষয়ের সহযোগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে, সেটা এখানে অনুপস্থিত। পুরুষ আধিপত্যের ঘেরাটোপে যৌনতার যে বোধ থেকে একটা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বঞ্চিত থাকে, একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে যে তার কোনো অন্যথা হবে, সেটা তো হতে পারে না। কিন্তু মেয়েটির ক্ষেত্রে আরো বড়ো জায়গা হলো এই যে, যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত উন্মেষের আগেই, তার শরীর মনের সেই বিকাশের পূর্বেই তার ঘাড়ে নেমে আসে মাতৃত্বের দায়িত্ব, যা আরো বেশি করে তার স্বাভাবিক যৌনতার দাবি থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। একান্ত স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কখনোই পরিণতি পায়

[১৩] বিদ্যাসাগর রচনাবলী (২০০৬) (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১২৯৭

না। কিন্তু এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না। বরং বিদ্যাসাগরের কাছে যেটা হওয়া উচিত তা হলো :

> সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেই স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবদ্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়রা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করতঃ সপ্রত্যয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।[১৪]

উল্লিখিত বক্তব্যটিকে স্থূল অর্থে ধরলে মনে হতে পারে যে নারী-পুরুষ মিলনের মধ্য দিয়ে সংসারধর্ম পালন বোঝাতে বিদ্যাসাগর হয়ত বংশরক্ষার মতো বিষয়ের কথা বলছেন। কিন্তু সংসারধর্ম বিষয়টিকে বৃহত্তর অর্থে যদি ভাবা যায় তাহলে এমন অনেক বিষয় তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যার মধ্যে হয়ত নারী-পুরুষের স্বাভাবিক শারীরিক কামনা বাসনা ও তার সুষ্ঠু নির্গমন অন্যতম। তা ছাড়া, এই পুস্তকে লিখিত আগের বক্তব্যের সঙ্গে যদি ধারাবাহিকতা মেনে এগোতে চাই সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে বিদ্যাসাগরের 'সংসারের নিয়ম রক্ষা' বিষয়টির মধ্যে যৌনতার প্রশ্নটি উঠে এসেছে। আর এই প্রশ্নটি হাজির করতে গিয়ে নারী-পুরুষের সমান সক্রিয়তার কথা তিনি বলছেন। যার অর্থ দাঁড়ায় সংকীর্ণ অর্থে বংশরক্ষার মতো সংসারধর্ম পালনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পুরুষের সাপেক্ষে সমানভাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ যে যৌন শারীরিক মিলনের মধ্য দিয়ে বংশরক্ষার মতো সংসার নিয়ম রক্ষিত হবে, সেখানে নারীর ভূমিকা পুরুষের মতোই স্বীকৃত হওয়া উচিত। অর্থাৎ নারীর যৌনতার প্রশ্নটিকেও এইদিক থেকে বিদ্যাসাগর স্বীকৃতি প্রদান করলেন। অন্যদিকে বৃহত্তর অর্থে 'সংসারের নিয়ম রক্ষা' বিষয়টিতে তার যৌনতা তো মান্যতা পেয়েই যাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মূল চিন্তা তো এই যৌনতার অস্বীকৃতি ঘিরে এবং যার ফলে নানা ব্যভিচারের সম্মুখীন তাঁর সমাজকে হতে হচ্ছে। সেইজন্য এখানেও নারীর যৌনতার প্রশ্নে পরোক্ষভাবে বিধবাবিবাহ পুস্তিকাদ্বয়ের মতোই তিনি আশ্রয় নিচ্ছেন বংশ, শ্রেণি, কুল-মর্যাদার মতো বিষয়ের। আপাত অর্থে বোঝাতে চাইছেন যে এর ফলে কীভাবে সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণির ব্যক্তির বংশ পরিচয়, কুলগত শ্রেষ্ঠত্ব পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা করতে গিয়ে তিনি রচনার শেষ অংশে এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন :

> ...ভদ্রকুলে, বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার প্রশ্নের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং

[১৪] তদ্‌শ, পৃ. ১২৯৮

> লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপকার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি যাহাতে এই বাল্য পরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান হউন।[১৫]

মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এবং সেটা অনেকাংশেই সত্য যে তিনি শেষপর্যন্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কথাই ভেবেছেন। বিধবাবিবাহের মতো বাল্যবিবাহের সমতার ক্ষেত্রেও তিনি মুখ্যত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবেই কাজ করেছেন। অর্থাৎ সেই একই শ্রেণিগত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এই অভিযোগকে শিরোধার্য করে যে গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে তা হলো যে গোটা সংস্কার প্রক্রিয়া কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক গণ্ডির বাইরে সেরকমভাবে প্রসারিত হতে পেরেছিল? সংস্কার আন্দোলনের একটা মুখ্য লক্ষ্যই তো ছিল এই আন্দোলনকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ত্বরান্বিত করা। এটা বৃহত্তর অর্থে সংস্কার আন্দোলনের সার্বিক সীমাবদ্ধতা, যার জন্য বিদাসাগরকে শুধু দায়ী করা চলে না। এখানে আরো একটি বিষয় হলো যে কুল, বংশমর্যাদা প্রভৃতির নামে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল তা মূলত নেমে এসেছিল মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের মহিলাদের ওপরেই। ফলে যে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতির কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্লেখ করেছেন, সেটাও ছিল মূলত এই শ্রেণির কাছেই প্রধান চিন্তার কারণ। পরিণতিতে নারীর যৌনতার যে প্রসঙ্গটিকে বিদ্যাসাগর বেশ সন্তর্পণে তুলতে চেয়েছিলেন তার লক্ষ্য বা টার্গেট তৎকালীন ভদ্রনারীরা। একটু তলিয়ে ভাবলে আমরা দেখব যে যতই আমরা বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করি না কেন, তাঁর সংস্কার আন্দোলনের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে, আজো এই সকল প্রশ্ন মূলত উচ্চবিত্ত তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৌদ্ধিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ। নারীর যৌনতার প্রশ্নটি একভাবে সীমিত হয়ে আছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই। এর থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জনমানসে সত্যই কি এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্র আজো তৈরি হয়েছে? নারী স্বাধীনতার আপাত স্বর্ণযুগে যেখানে নারীর যৌনতার স্বীকৃতির বিষয়টি শুধু শিক্ষিত মহলেই চর্চার বিষয়, সেখানে তাঁর সময়কালে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর যে একটি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে তো আমাদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হোক না তা শুধু ভদ্রঘরের নারীদের জন্য। বিধিনিষেধের যাবতীয় ঘেরাটোপ তো সব থেকে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদেরই জন্য।

এই প্রসঙ্গেই বোধকরি বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রোধ বিষয়কে সামনে রেখে একটি আপাত হাস্যকর অথচ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক বহুবিবাহ বিরোধী রচনায় সেই বর্ণনা এইরূপে :

---

[১৫] তদৃশ, পৃ. ১৩০২

> ...পুত্রবধূর ঋতুদর্শন হইয়াছে। সে যাহার কন্যা তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা জামাতাকে আনাইয়া, কন্যার পুনর্বিবাহ সংস্কার নির্বাহ করেন। পত্রদ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক পত্রোত্তরে অধিক টাকার দাওয়া করিলেন, কন্যার পিতা তত টাকা দিতে অনিচ্ছু বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দিলেন না, সুতরাং, পুত্রবধূর পুনর্বিবাহ সংস্কার এ জন্মের মত স্থগিত রহিল।
>
> ...বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই; তথাপি কোনও বঙ্গকুলীনের ভার্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করার পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় করিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলোভে চরিতার্থ হইয়া, সর্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জীরের গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হয়েছিল।[১৬]

আসলে এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বহুবিবাহের কুপ্রভাব দেখাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর এটাও চোখে আঙুল দিয়ে তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতকুল ও শাস্ত্রবেত্তাদের বোঝাতে চান যে নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি একটি এমন সত্য যা চোখ বন্ধ করে রেখে, হাজারো বিধিনিষেধ চাপিয়ে অস্বীকার করা যায় না। এই হিসেবে বিধবাবিবাহ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে পরোক্ষ স্বীকৃতি প্রথম ধাপ, আর বহুবিবাহ প্রতিরোধ নিঃসন্দেহে তার পরবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু নারীর যৌনতার স্বীকৃতির বিষয়টি শুধু তার যৌন ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নটিকে নিয়ে এমন নয়। একই সঙ্গে তার যৌন অসম্মতির প্রশ্নকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেয়। ক্ষেত্রবিশেষে হয়তবা প্রথমটির তুলনায় আরোও বেশি করে, বিশেষত এই 'পুরুষকেন্দ্রিক' সামাজিক পরিসরের আবহে। কিন্তু যৌনতার স্বীকৃতির সঙ্গে নারীর যৌন অসম্মতির দিকটি কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত?

আবার আমরা এ ক্ষেত্রে মনোবিদ অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য নেব। যৌনতার স্বীকৃতির প্রশ্নে যৌন অসম্মতির বিষয়টিকে তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে চাইছেন কীভাবে? তিনি যেভাবে এই বিষয়টিকে দেখেন, তা হলো :

> এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে বাড়ির মধ্যে নারী নিরাপদ। একাধিক পুংলিঙ্গের নিজেদের ঝামেলাতেও ধর্ষিত হচ্ছেন তাদেরই কারওর ঘরনী। ছিন্ন নারী শরীর যেন একের প্রতি অন্যের হুমকির নথিপত্র। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত পুরুষ বা অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষ তাকে ছোঁবেন না এড়িয়ে যাবেন সেটাও

[১৬] তদৃশ, পৃ. ৯৭৩

> আগাগোড়াই তাদেরই মর্জি...নিজের যৌনতার ওপর নারীর নিজের অধিকার বহু পুরুষের কাছে বিদেশি ভাষার মতো দুরূহ। যেন নারী নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া মানে আবারও খোঁচা খাওয়া পৌরুষে একচিমটে নুন।[১৭]

অনস্বীকার্য যে তাঁর সময়ে বিদ্যাসাগর নারীর যৌনতার প্রশ্নে তাদের অসম্মতির বিষয়টি এইভাবে ভাবেন নি। মানে তাঁর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ তাঁকে এইভাবে ভাবার সুযোগ দেয় নি। তবু এখানে একটা 'কিন্তু' আছে। 'বাল্যবিবাহের দোষ' পুস্তিকায় যখন এই উক্তি করেন যে 'বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সমুধর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে', তখন কি তিনি ঘুরিয়ে এটাই বলতে চান না যে বাল্যকালে যেহেতু যৌনতা বিষয়ক ধারণা পরিপক্কতা পায় না সেই কারণে নারীর দিক থেকে যৌন অসম্মতির মতো কোনো ধারণা তার মধ্যে তৈরি হয় না? বিশেষ করে যেখানে 'প্রণয়' শব্দটি বহুধা ইঙ্গিতবাহী। শব্দটি একদিকে যেমন নারী-পুরুষের মিলনের আবেগগত দিককে নির্দেশ করে, তেমনই শারীরিক নৈকট্যকেও তুলে ধরে। অতএব, শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হলো এই, সামগ্রিকভাবে আমরা যে বিদ্যাসাগরকে একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে গণ্য করি, সেখানে অন্যান্য দিকের মধ্যে সমস্ত সংস্কার, বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে নারীর স্বাভাবিক যে যৌনতার প্রশ্ন তাকে কোথাও মান্য করা, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মতো যথার্থ বৈপ্লবিক চিন্তার উপাদান আছে। উনিশ শতকের একজন মনীষীরূপে এখানেই তাঁর দূরদর্শিতা তথা সত্যিকারের আধুনিক মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩.

কিন্তু নারীর যৌনতা প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে পুনর্বার তাকে বিবাহ দেওয়াটাই একমাত্র পথ ছিল? বিধবাবিবাহের সীমাবদ্ধতার প্রতি যারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা এই প্রশ্নটাই তুলেছেন। আসলে বিধবাদের পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি পারিবারিক ক্ষেত্রের বাইরে নারীর বাইরের জগতে প্রবেশাধিকার আটকাতে চেয়েছেন, এটাই সমালোচকদের মূল বক্তব্য। একভাবে বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারকদের হাত ধরে পারিবারিক চৌহদ্দিকে অতিক্রম করে বাহির জগতের বৃহত্তর পরিসরে তার মুক্তি অর্জনের যে পথটি উন্মোচিত করা যেত, বিধবাবিবাহের মতো বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টা সেই পথে বাধা তৈরি করল। এই সংস্কার নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের পারিবারিক পরিসরের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই পুনরায় ফিরিয়ে দিল। এখন এই ধরনের সমালোচনা বিধবাবিবাহ আন্দোলনের যে সার্বিক রূপরেখা তার সঙ্গে জড়িত। বস্তুত, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ বিদ্যাসাগরের দ্বারা পরিচালিত অথবা সমর্থিত এই সবকটি আন্দোলনই শেষপর্যন্ত পারিবারিক পরিসরে নারীর স্থানকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছে, এই বিষয়ে কোনো বিশেষ সন্দেহ নেই। আবার এই ক্ষেত্রে শুধু বিদ্যাসাগরকে দায়ী করাও উচিত নয়।

[১৭] অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯), অনু-সঙ্গ, পৃ. ৯৮

নারী বিষয়ক প্রায় সব ধরনের সংস্কার আন্দোলন পরিবারের সাবেকী ঐতিহ্যের জায়গাটিকে কোনোভাবে পরিবর্তন করতে চায় নি। যেটা চেয়েছিল তা হলো সেই পরিবারে নারীর অবস্থানকে আরো একটু মর্যাদামণ্ডিত করতে। সব থেকে বড়ো কথা হলো সেই সময়ের নিরিখে, তা বিদ্যাসাগর যতই নিজে বৈপ্লবিক ভাবনার শরিক হন, তাঁর পক্ষে কালকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। সেই হিসেবে নারীর যৌনতার প্রশ্নটিকে মাথায় রেখে তাদের পুনর্বার বিবাহের ব্যবস্থাই ছিল বোধহয় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্তত বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে।

আরো একটি বিষয় বুঝতে হয়ত আমরা ভুল করছি। নারীর যৌনতার প্রশ্নটিকে আজ আমরা যেভাবে বৈবাহিক বা পারিবারিক বিধি ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে ভাবার চেষ্টা করছি, বিদ্যাসাগরের সময়ে সেইরকম ভাবনার কোনো অবকাশ ছিল না। ভারতে আশির দশকের পর থেকে যেভাবে গর্ভনিরোধক পিল-এর ব্যবহার শুরু হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে আজ হয়ত পারিবারিক বা বৈবাহিক কাঠামোর বাইরে নারীর যৌনতার বিষয়টিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মৈত্রী চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে আমাদের জানাচ্ছেন যে এই গর্ভনিরোধক পিল-এর ব্যবহার নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রশ্নে এমন সুযোগ তৈরি করেছে, যেখানে রাষ্ট্র থেকে পরিবার হাজার নজরদারি চালিয়েও এর ব্যবহার করা থেকে একজন নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ। এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে নারীর জন্য আইনের বর্ধিত ক্ষেত্র। এই আইনি অধিকারের সুবাদে একজন নারীকে এই গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার নিকটাত্মীয়ের, এমনকি পিতা অথবা স্বামীর অনুমতিও বাধ্যতামূলক নয়।[১৮] উনিশ শতকের মধ্যভাগে না ছিল নারীর জন্য এমন সহায়ক আইনি সুরক্ষা, না ছিল গর্ভনিরোধক পিল। সমর্থ বিধবাদের আবার বিয়ে না দিয়ে এই যৌনতার প্রশ্নের সমাধান বিদ্যাসাগর করতেন কীভাবে! পালটা একটা প্রশ্নও এই ক্ষেত্রে উঠে আসতে পারে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে যখন নারীর যৌনতার প্রশ্নে বেশ কিছু সহায়ক আইনি এবং গর্ভরোধমূলক ব্যবস্থার সুযোগ তৈরি হয়েছে, তৎসত্ত্বেও বিবাহ বা পারিবারিক কাঠামোর ভূমিকা কি এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে? সত্য যে নারীর যৌনতার আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে উনিশ শতকের ভ্রূণহত্যার অভিশাপ হয়ত আজ তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু তা বলে কি বিবাহ ও পরিবার তার প্রতিষ্ঠানিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে? এখনো পর্যন্ত এর উত্তর, না। যদিও মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ যারা আজকের আধুনিক প্রযুক্তিমূলক অর্থব্যবস্থার পেশাদার গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত, তারা এই যৌনতার প্রশ্নটিকে বিবাহ/পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে ভাবতে চাইছেন। সেইজন্য তারা সহবাস বা লিভ-ইন সম্পর্কের মধ্যে হয়ত নিজেদের আবদ্ধ করছেন। তবে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালির কাছে নারীর যৌনতার প্রশ্নটি বিবাহ এবং পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। তার যৌন ইচ্ছা এবং অসম্মতি আজো আবর্তিত হচ্ছে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের চারপাশে। তা না হলে বৈবাহিক ধর্ষণের মতো বিষয়ের আলোচনা সমাজে ঠাঁই

[১৮] মৈত্রী চৌধুরী (২০০৫) (সম্পাদিত), ফেমিনিজম ইন ইন্ডিয়া, কালি ফর উওম্যান, নিউ দিল্লী, পৃ. ২৬১-২৬২

পেত না। পরিশেষে কথাটি হলো এই যে, পরোক্ষে নারীর যৌনতার প্রসঙ্গটিকে তুলে ধরে বিদ্যাসাগর যেভাবে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের উপর ভরসা করেছিলেন অথবা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, একবিংশ শতাব্দীতে এসে তাঁর সেই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ অন্তত এই প্রশ্নে বৃহত্তর পরিসরে কোনো প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি। সে এখনো বিবাহ ও পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের বিকল্প তৈরি করতে পারে নি। এখানেই বিদ্যাসাগর সফল। সফল তাঁর নারীর যৌনতার প্রশ্ন ও তার সমাধান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা, মানে বিধবাবিবাহ আন্দোলন।

শেখর শীল সংযুক্ত অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। silsekhar600@gmail.com